একগুচ্ছ মুক্তাদানা: দ্বীনে ইসলামীর সৌন্দর্য

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ আবদুর রহমান ইবন নাসের ইবন সা'দী রহ.

অনুবাদ : মোঃ আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سَعدي

ترجمة: محمد أمين الإسلام

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1433

IslamHouse.com

একগুচ্ছ মুক্তাদানা : দ্বীনে ইসলামীর সৌন্দর্য

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি; তাঁর নিকট তাওবা করি; আর আমাদের নফসের সকল খারাপি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথহারা করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল; তাঁর প্রতি অনেক সালাত (দরূদ) ও সালাম।

অতঃপর:

নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত দ্বীনে ইসলাম সকল ধর্ম ও জীবনব্যবস্থার চেয়ে পরিপূর্ণ, সর্বোত্তম ও সর্বমহান দ্বীন ও জীবনব্যবস্থা। আর এই দ্বীনটি এমন সার্বিক সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা, যথার্থতা, সম্প্রীতি, ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা আল্লাহ তা‘আলার জন্য সার্বিক পরিপূর্ণতা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ব্যাপকতার সাক্ষ্য বহন করে; আর তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এই সাক্ষ্য বহন করে যে, তিনি সত্যিকারভাবে আল্লাহর রাসূল এবং তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত; যিনি মনগড়া কোন কথা বলেন না:﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤﴾ [النجم:٤] “তা তো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৪]

সুতরাং এই ইসলামী দ্বীন আল্লাহ তা‘আলার জন্য তাঁর একত্ব ও সার্বিক পরিপূর্ণতার ব্যাপারে এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রিসালাত ও সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দলিল ও সর্বমহান সাক্ষী।

আমার এই লেখার উদ্দেশ্য হল, এই মহান দ্বীনের সৌন্দর্যের নীতিমালার বিবরণ সম্পর্কে আমার যেটুকু জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, তা প্রকাশ করা। যদিও এই দ্বীন তার মহত্ব, সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার যেসব দিককে অন্তর্ভুক্ত করে, তার সামান্যতম অংশ প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় আমার জ্ঞান ও জানা-শোনা খুবই সীমিত এবং তার সৌন্দর্যগুলো বিস্তৃত ব্যাখ্যা দূরে থাক, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করার মতো যোগ্যতায় আমি অতি দুর্বল; তবুও, কোন মানুষ তার সবটুকু না জানলে এবং তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে না পরলে তার এই অংশবিশেষ না জানার অক্ষমতা ও দুর্বলতার কারণে সে যতটুকু জানে, ততটুকু প্রকাশ করা থেকে থেকে বিরত থাকাটা তার জন্য উচিত হবে না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যাতীত কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না: অর্থাৎ- “তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]

অবলম্বন কর।” [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬]

আর এই জ্ঞান অর্জন করার মধ্যে বহু রকমের উপকারিতা রয়েছে। যেমন:

- এই শ্রেষ্ঠ ও মহৎ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করাটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয় সম্পর্কে জানা, গবেষণা করা, চিন্তা-ভাবনা করা এবং সেই সম্পর্কে জানা ও বুঝার জন্য প্রত্যেকটি পন্থা অবলম্বন বান্দার সার্বিক ব্যস্ততা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে সর্বোত্তম; আর আপনি এই কাজে যে সময় ব্যয় করবেন, তা একান্ত আপনার কল্যাণের জন্যই, আপনার অকল্যাণের জন্য নয়।
- নিয়ামতরাজি সম্পর্কে জানা ও তার সম্পর্কে আলোচনা করতে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন; আর তা বড় ধরনের সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। আর সন্দেহ নেই যে, এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা মানেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক তাঁর বান্দাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতরাজির শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয়া এবং আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা করা। এই নিয়ামত হচ্ছে: ইসলামী দ্বীন, যা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্য কোন দ্বীনকে গ্রহণ করবেন না। ফলে এই আলোচনাটি হবে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এবং এই নিয়ামত বৃদ্ধির আবেদনস্বরূপ।
- নিঃসন্দেহে ঈমান ও তার পরিপূর্ণতার ব্যাপারে মানুষের পরস্পর অনেক বড় ব্যবধানে রয়েছে। আর যখনই কেউ এই দ্বীন সম্পর্কে বেশি জানতে পারবে, তাকে বেশি সম্মান করবে এবং তার প্রতি অধিক খুশি ও আনন্দিত থাকবে, তখনই তা তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করবে এবং আস্থা ও বিশ্বাসকে অধিক হারে বিশুদ্ধ করবে। কারণ, এই বিষয়টি ঈমানের সকল মূলনীতি ও নিয়ম-কানুনের স্পষ্ট প্রমাণ।

- দ্বীন ইসলামের দিকে সবচেয়ে বড় দাওয়াত (আহ্বান) হল তার (ইসলামের) যাবতীয় সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করা, যে সৌন্দর্যগুলো প্রত্যেক সুস্থ জ্ঞান ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই সাদরে গ্রহণ করে।

সুতরাং যদি এই দ্বীনের দিকে আহ্বান করার জন্য এমন কোন ব্যক্তিবর্গ উদ্যোগ গ্রহণ করে যারা এর হাকিকত ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারে এবং সৃষ্টির নিকট এর কল্যাণকর দিকগুলো বর্ণনা করতে পারে, তবে তা-ই সবাইকে এই দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে; কেননা, তখন তারা এ দ্বীনকে ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রত্যক্ষ করবে এবং এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উপযুক্ততা লক্ষ্য করবে। এক্ষেত্রে বিরোধীদের সন্দেহ দূর করা ও তাদের ধর্মের সমালোচনার উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। কেননা, তখন এই দ্বীন নিজেই এর সাথে বিরোধপূর্ণ সকল সন্দেহ দূর করে দেবে; কারণ, এটিই সুস্পষ্ট বর্ণনা ও মজবুত বিশ্বাসে পরিণত করার মত দলিল-প্রমাণাদির দ্বারা ব্যাখ্যাত প্রকৃত সত্য।

তাই এই দ্বীনের আসল চিত্রের অংশবিশেষ ফুটিয়ে তোলাই তা গ্রহণ করা ও অন্যের উপর একে শ্রেষ্ঠ করার ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ ভূমিকা রাখবে।

আর জেনে রাখুন, ইসলামী জীবনব্যবস্থার সৌন্দর্য ব্যাপকভাবে তার সকল মাসআলা, দলিল-প্রমাণ এবং নীতিমালা ও শাখা-প্রশাখায় প্রমাণিত। এছাড়াও শরীয়তের বিধিবিধান সংক্রান্ত জ্ঞান ও আহকামে এবং সৃষ্টিজাগতিক ও সামাজিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা প্রমাণিত। এখানে এগুলো সম্পূর্ণ অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ উদ্দেশ্য নয়; কারণ, তা অনেক ব্যাপক আলোচনার দাবি করে। বরং এখানে উদ্দেশ্য হল, এই

দ্বীনের এমন কিছু উপকারী বিষয় ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা, যার দ্বারা দ্বীনের অন্যান্য সৌন্দর্যের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক প্রত্যেকের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই দৃষ্টান্তগুলো মূলনীতিমালা ও শাখা-প্রশাখায় এবং ইবাদত ও পারস্পরিক লেনদেন— সর্বত্র বিস্তৃত।

তাই আমরা বলতে চাই আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ে, তাঁর নিকট এই প্রত্যাশায় যে, তিনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন, আমাদেরকে শিক্ষা দেবেন এবং আমাদের জন্য খুলে দেবেন তাঁর দান ও অনুগ্রহের ভাণ্ডার, যার দ্বারা আমাদের অবস্থার উন্নতি হবে এবং আমাদের কথা ও কাজগুলো সঠিক হবে:

প্রথম দৃষ্টান্ত

দ্বীন ইসলাম ঈমানের সেই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তা‘আলার বাণীতে:

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦﴾ [سورة البقرة: ١٣٦]

“তোমরা বল, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা ইব্রাহীম, ইস্‌মা‘ঈল, ইসহাক, ইয়া‘কূব ও তার বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে, এবং যা মূসা, ‘ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব-এর নিকট হতে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না । আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী’।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩৬]

০ আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তাঁর বান্দাদেরকে আদিষ্ট এই মহান নীতিমালা এমন, যার উপর সকল নবী ও রাসূল ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর তা সর্বোত্তম সৎকর্ম ও বিশ্বাসসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। যথা: আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলগণের ভাষায় নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পছন্দসই পথে পরিচালিত হওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

o সুতরাং এটি এমন এক দ্বীন, যার মূল বিষয় হল আল্লাহর প্রতি ঈমান; আর যার ফলাফল হল এমন প্রত্যেক কাজে-কর্মে ধাবিত হওয়া, যা তিনি (আল্লাহ) ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন; আর তা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য সম্পাদন করা— এর চেয়ে সুন্দর, মহান ও উত্তম কোন দ্বীন বা জীবনব্যবস্থার কল্পনা করা যায় কি?

o আর এটি এমন এক দ্বীন, যার নির্দেশ হচ্ছে নবীগণকে প্রদত্ত সকল কিছুর প্রতি ঈমান আনা; তাঁদের রিসালাতকে বিশ্বাস করা; তাঁরা তাঁদের রব ও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে সত্য নিয়ে এসেছেন তার স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তাঁদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি না করা; আর এ স্বীকৃতি দেওয়া যে, তাঁরা সকলেই আল্লাহর সত্যবাদী রাসূল ও তাঁর একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত বান্দা— সেই দ্বীনের প্রতি কোন প্রকার আপত্তি ও দুর্নাম রটনা করা অসম্ভব।

o এই দ্বীন সকল হকের নির্দেশ দেয় এবং সকল প্রকার সত্যের স্বীকৃতি প্রদান করে; আল্লাহ কর্তৃক রাসূলদেরকে প্রদত্ত ওহীর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দ্বীনি বাস্তবতা সাব্যস্ত করে এবং স্বভাবগত, উপকারী ও যৌক্তিক বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে সাথে নিয়ে চলে। আর তা কোন কারণেই কোন হক ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না এবং কোন মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে না। আর তাতে কোন বাতিলের প্রচলন সফল হয় না। সুতরাং এই দ্বীন অপরাপর সকল ধর্মের উপর তদারককারী ও তত্ত্বাবধায়ক।

এই দ্বীন সুন্দর আমল (কর্ম), উত্তম চরিত্র ও জনকল্যাণের নির্দেশ দেয় এবং ন্যায়পরায়ণতা, সম্মান, সম্প্রীতি ও কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করে;

আর তা সাবধান করে সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতন, সীমালংঘন ও দুশ্চরিত্র থেকে। যে পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকেই নবী ও রাসূলগণ স্বীকৃতি দিয়েছেন, এই দ্বীন সেই বৈশিষ্ট্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণের দিকেই কোন বিধান বা শরী'আত আহ্বান করেছে, এই দ্বীন তার প্রতিই উৎসাহিত করেছে; আর প্রতিটি অকল্যাণকর বিষয় থেকেই নিষেধ করেছে ও দূরত্ব বজায় রেখে চলতে নির্দেশ দিয়েছে।

০ **মোটকথা:** এই দ্বীনের আকিদা-বিশ্বাসসমূহ এমনই যে, তা দ্বারা অন্তর পবিত্র হয় ও আত্মা পরিশুদ্ধ হয় এবং তার দ্বারা উত্তম চরিত্র ও সৎকর্মের সৌন্দর্য দৃঢ়মূল হয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

ঈমানের পরে ইসলামের বড় বড় বিধানসমূহ হল: সালাত (নামায) প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রমযান মাসে সাওম (রোযা) পালন করা এবং সম্মানিত ঘরের হজ করা সে সম্পর্কে

শরীয়তের এই মহান বিধানসমূহ ও তার বিরাট উপকারিতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। এই বিধিবিধানের দাবিস্বরূপ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা ও এর প্রতিদানস্বরূপ ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা নিয়েও চিন্তা করুন।

০ সালাতের মধ্যে যা আছে, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন। এতে রয়েছে আল্লাহর জন্য ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা, তার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ, প্রশংসা, দো'আ ও প্রার্থনা, বিনয়। ঈমানের বৃক্ষের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব বাগিচার ক্ষেত্রে পানি সেচ দেয়ার মতোই। দিনে ও রাতে যদি বার বার সালাতের ব্যবস্থা না থাকত, তবে ঈমান-বৃক্ষ শুকিয়ে যেত এবং তার কাঠ বিবর্ণ হয়ে যেত; কিন্তু সালাতের বিভিন্ন ইবাদাতের কারণে ঈমান-বৃক্ষ বৃদ্ধি পায় এবং নতুনত্ব লাভ করে।

এছাড়াও সালাতের অন্তর্ভুক্ত নানা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন; যেমন: আল্লাহর যিকির ও স্মরণে মগ্ন থাকা— যা সব কিছুর চেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ। কিংবা এ দিকে চিন্তা করুন: সালাত সকল প্রকার অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

o এবার যাকাতের তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করুন এবং লক্ষ্য করুন এর মধ্যে সম্মানজনক চরিত্রকে স্বভাব হিসেবে গ্রহণের যে ব্যাপার রয়েছে সেই দিকে; যেমন: দানশীলতা, উদারতা, কৃপণতার স্বভাব থেকে দূরে থাকা, আল্লাহ তাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, সে জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং ধন-সম্পদকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা থেকে হেফাযত করা। এছাড়াও যাকাতে যা আরও রয়েছে, তা হল: সৃষ্টির প্রতি ইহসান তথা সদ্ব্যবহার করা, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা এবং যাকাতের প্রতি মুখাপেক্ষীদের সব কল্যাণকর প্রয়োজন পূর্ণ করা।

যাকাতে রয়েছে অভাবগ্রস্তদের অভাব পূরণের ব্যবস্থা; রয়েছে জিহাদ ও মুসলিমদের প্রয়োজনীয় সার্বিক কল্যাণকর কাজের জন্য সহযোগিতা; রয়েছে দারিদ্র্য ও দরিদ্রের কশাঘাত প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা; রয়েছে আল্লাহর বিনিময়ের প্রতি আস্থা, তাঁর প্রতিদানের প্রত্যাশা ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

o আর সাওম (রোযা) পালনের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর ভালবাসা ও নৈকট্য লাভের আশায় ব্যক্তির মন কর্তৃক তার প্রিয়বস্তু ত্যাগের অনুশীলন এবং মনকে প্রচণ্ড ইচ্ছা ও ধৈর্যশক্তি সম্পন্ন হওয়ার অভ্যস্ত করা।

আর তাতে ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা শক্তিশালী হয় এবং নফসের ভালবাসার উপরে তাঁর (আল্লাহ্‌র) ভালবাসা বাস্তবায়ন হয়। আর এই জন্যই সাওম একান্তভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে, তিনি সকল আমলের মধ্য থেকে এটিকে নিজের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন।

o আর হজের মধ্যে যেসব বিষয় রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: সম্পদ ব্যয় করা, কষ্ট সহ্য করা এবং আর তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা; তাঁর নিকট হাজির হওয়া; তাঁর ঘরে ও আঙ্গিনায় তাঁর নিকট অনুনয়-বিনয় করা এবং বিভিন্ন প্রকার আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর দাসত্ব করা এমনসব পবিত্র স্থানসমূহে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও তাঁর ঘরের মেহমানদের জন্য দস্তরখানরূপে সম্প্রসারিত করেছেন।

আর এতে রয়েছে আল্লাহর প্রতি সম্মান ও পরিপূর্ণ বিনয় প্রদর্শন; নবী-রাসূল ও আল্লাহর একনিষ্ঠ ও পরিশুদ্ধ বান্দাদের অবস্থা স্মরণ এবং তাদের প্রতি ঈমানকে সুদৃঢ়করণ ও তাঁদের ভালবাসাকে গাঢ় করে তোলা।

আর তার মধ্যে আরও রয়েছে: মুসলিম সম্প্রদায়ের পারস্পরিক পরিচিতি; তাদের মধ্যে ঐক্য গঠনের চেষ্টাসাধনা এবং তাদের বিশেষ ও সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করা। এছাড়াও এর বহু সৌন্দর্য রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। সুতরাং হজ হচ্ছে দ্বীনের অন্যতম মহান সৌন্দর্যপূর্ণ বিষয় এবং মুমিনদের অর্জিত বড় ধরনের উপকারী বস্তু। এ বিষয়ে এটি একটি সংক্ষিপ্ত মনোযোগ আকর্ষণ।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত

শরী'আত প্রবর্তক ঐক্যবদ্ধ ও জোটবদ্ধভাবে থাকার বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন এবং বিচ্ছিন্নভাবে থাকা ও মতবিরোধ করা থেকে যে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন সে সম্পর্কে।

o এই বড় ধরনের মূলনীতিটির ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যসমূহ থেকে অনেক বক্তব্য রয়েছে।
আর ন্যূনতম বিবেক-বুদ্ধি আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে এই নির্দেশের উপকারিতা এবং এর উপর যেসব ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণসমূহ বিন্যস্ত হয় এবং যার দ্বারা যাবতীয় ক্ষতিকারক ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ বিষয়সমূহ বিদূরিত হয় সেগুলো সম্পর্কে।

o আর এই কথাও অস্পষ্ট নয় যে, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ শক্তি এই মূলনীতির উপরই আবর্তিত হয়।
মুসলিমগণ ইসলামের শুরুতে এমন দ্বীনের দৃঢ়তা ও অবস্থার যথার্থতা উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে জানা যায়, যাতে তারা ব্যতীত মান-সম্মানের এই পর্যায়ে অপর কেউ উন্নীত হতে পারে নি। কেননা তারা এই মূলনীতিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং তা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রচণ্ড আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে যে, তা-ই তাদের দ্বীনের প্রাণ।
এর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে নিম্নের দৃষ্টান্তে:

চতুর্থ দৃষ্টান্ত

ইসলাম যে সম্প্রীতি, বরকত (প্রবৃদ্ধি) ও ইহসানের (অনুগ্রহের) দ্বীন এবং তা মানবজাতির উপকারে উৎসাহিত করে সে সম্পর্কে।

এই দ্বীন তথা জীবনব্যবস্থা সম্প্রীতি, উত্তম লেনদেন, পরোপকারের প্রতি আহ্বান এবং এগুলোর বিপরীতধর্মী সকল কর্মকাণ্ড থেকে নিষেধ করার মত যে নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোই একে যুলুম-নির্যাতন, সীমালংঘন, দুর্নীতি ও সম্ভ্রমহানীর অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ্ত আলোতে পরিণত করেছে।

o এর কারণেই এই দ্বীন সম্পর্কে জানার পূর্বে যারা এর ঘোর শত্রু ছিল, এই দ্বীন তাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে তুলেছে, শেষপর্যন্ত তারা তার ছায়াময় ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

আর তা এমন দ্বীন, যা তার অনুসারীদের উপর সহনুভূতিশীল। ফলে তাদের অন্তর থেকে সহানুভূতি, ক্ষমা ও অনুগ্রহ সঞ্চালিত হয় তাদের কথায় ও কাজে; আর এসব গুণাবলীর প্রভাব তার শত্রুদের উপরও বিস্তৃত হয়, শেষপর্যন্ত তারা এই দ্বীনের পরম বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। তাই তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে এই দ্বীনে দীক্ষিত হয়েছে; আবার তাদের কেউ কেউ তার প্রতি বিনয় প্রকাশ করে, তার বিধানসমূহের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তার নিজ ধর্মের বিধানাবলীর উপর সেগুলোকে মর্যাদা দিয়েছে; কারণ, এ দ্বীনেই রয়েছে সত্যিকারের ন্যায়পরায়ণতা ও সহানুভূতি।

পঞ্চম দৃষ্টান্ত

ইসলাম যে প্রজ্ঞাপূর্ণ দ্বীন, স্বভাব-দ্বীন এবং বিবেক, সততা ও সফলতার দ্বীন সে সম্পর্কে।

০ এই মূলনীতির ব্যাখ্যা হল: এই দ্বীন মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা সংশ্লিষ্ট যেসব বিধানাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে, সেগুলোকে স্বভাব-প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধি গ্রহণ করে এবং সত্য ও বাস্তবতার অনুসারী ব্যক্তি তাকে মেনে নেয়; আর এই দ্বীন যেসব বিধিবিধান ও সুন্দর ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করে, তা প্রত্যেক যামানা ও স্থান বা অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত।

তার সকল তথ্য সঠিক ও সত্য। পূর্বে বা সাম্প্রতিককালে এমন কোন জ্ঞানের আগমন ঘটেনি এবং ঘটাও অসম্ভব, যা তাকে খণ্ডন করতে পারে অথবা তাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে; বরং সকল প্রকার বাস্তব জ্ঞান তাকে শক্তিশালী করে ও সমর্থন প্রদান করে; আর এটা এর যথার্থতার উপর বড় ধরনের প্রমাণ।

০ ন্যায়পরায়ণ বিশ্লেষকগণ বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রত্যেক জ্ঞান, ধর্মীয়, পার্থিব বা রাজনৈতিক যা-ই হোক না কেন, সেগুলোর ব্যাপারে আল-কুরআনের সন্দেহমুক্ত দিকনির্দেশনা রয়েছে।

সুতরাং ইসলামের শরীয়াতে বা নিয়ম-কানুনের মধ্যে এমন কিছু নেই, যা বিবেক-বুদ্ধি অসম্ভব মনে করে; বরং তার মধ্যে এমন বিধানাবলী রয়েছে, প্রখর যুক্তি-বুদ্ধিও যার সত্যতা, উপকারিতা ও যথার্থতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে।

অনুরূপভাবে তার সকল আদেশ ও নিষেধ ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ, তাতে কোন প্রকার যুলুম নেই। তার যে কোন আদেশই নির্ভেজাল কল্যাণ অথবা অগ্রধিকার পাওয়ার উপযোগী কল্যাণ; আর প্রত্যেক নিষেধই শুধু এমন বস্তু বা বিষয় থেকে, যা নির্ভেজাল অকল্যাণকর অথবা যার মধ্যে উপকারের চেয়ে ক্ষতির দিক বেশি।

আর যখনই বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার বিধানসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন এই মূলনীতির প্রতি তার ঈমান তথা বিশ্বাস ও আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং সে জানতে পারবে যে, তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যিনি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত।

ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত

এই দ্বীনে জিহাদের যে নির্দেশ রয়েছে, অনুরূপভাবে যাবতীয় সৎকর্মের নির্দেশ এবং সকল ধরনের অসৎকর্ম থেকে নিষেধের যে নির্দেশ রয়েছে সে সম্পর্কে।

আর যে জিহাদ এই দ্বীন নিয়ে এসেছে, তার উদ্দেশ্য হল, এই দ্বীনের অধিকারের প্রতি সীমালঙ্ঘনকারীদের এবং তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের সীমালঙ্ঘন প্রতিরোধ করা।

আর এটাই জিহাদের প্রকারসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম; এর দ্বারা কোন লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল উদ্দেশ্য করা হয় নি।

আর যে ব্যক্তি এই মূলনীতির দলিলসমূহের দিকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা কর্তৃক তাদের শত্রুদের সাথে আচরণের বিবরণের দিকে দৃষ্টি দেবে, সে নিঃসন্দেহে জানতে পারবে যে, জিহাদ অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম এবং সীমালংঘনকারীদের বাড়াবাড়ি প্রতিরোধ করার অন্যতম উপায়।

o সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করার বিষয়টিও অনুরূপ। কেননা, ততক্ষণ পর্যন্ত এই দ্বীন সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অনুসারীগণ তার মূলনীতি ও বিধানসমূহের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে; যথার্থতার শীর্ষে আছে বলে প্রমাণিত প্রদত্ত

নির্দেশাবলী মেনে চলবে এবং অকল্যাণকর ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকবে।

আর তার অনুসারীগণ এ জন্যও এই (জিহাদ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ) কাজে সার্বক্ষণিক রত থাকবে, যাতে তাদের কেউ কেউ কোন কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত থেকে এবং সাধ্যের আলোকে অর্পিত আবশ্যকীয় কর্তব্য পালন থেকে অক্ষমতা প্রকাশ করে তাদের অত্যাচারী মনকে অলঙ্কৃত করতে না পারে।

আর পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী আদেশ ও নিষেধ ছাড়া এই কার্যক্রম পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না; আর এটা এ দ্বীনের মহান সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যকীয় উপদানসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান উপাদান বলে বিবেচিত। যেমনিভাবে এর মধ্যে রয়েছে তার অনুসারীদের মধ্যে যারা বক্রতা অবলম্বন করে তাদেরকে পুনর্গঠন ও সুশৃঙ্খল করা; তাদের থেকে দুষ্কর্মের মূলোৎপাটন করা এবং তাদের উপর ভাল কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া।

আর তারা দ্বীনকে কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ, তার আওতাধীন থাকা এবং তার শরী‘আত মানার ব্যাপারটি স্বেচ্ছায় মেনে নেয়ার পর, যেভাবে চাইবে চলবে এ ধরনের অবাধ-স্বাধীনতা প্রদান করা তাদের নিজেদের উপর ও সমাজের উপর বড় ধরনের যুলুম-নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত; বিশেষ

করে শরী‘আত, যুক্তি ও প্রথার মাধ্যমে স্বীকৃত আবশ্যকীয় অধিকারসমূহ খর্ব করার শামিল হবে[1]।

---

[1] সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধের আওতায় আসতে হবে। এটা কোনোভাবেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিপরীত নয়। [সম্পাদক-যা.]

সপ্তম দৃষ্টান্ত

ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, যৌথ কারবার ও বিভিন্ন প্রকার লেনদেন, যাতে মানুষের মাঝে নগদে, বাকিতে, লাভে ও লোকসানে বিভিন্ন পণ্যের আদান-প্রদান হয়, তার বৈধতা সম্পর্কে শরী'আত যা নিয়ে এসেছে, সেই প্রসঙ্গে।

পূর্ণাঙ্গ শরী'আত এই প্রকারের লেনদেন ও সকল বান্দার জন্য ব্যাপকভাবে তার বৈধতা নিয়ে এসেছে; কারণ, তা আবশ্যকীয়, প্রয়োজনীয় ও পরিপূর্ণতার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল কল্যাণকর বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে; আর এগুলো বান্দার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে এবং এর দ্বারা তাদের কর্মকাণ্ড ও সার্বিক অবস্থার উন্নতি হয়; আর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের জীবনধারা।

আর শরী'আত এই সকল বস্তুর বৈধতার জন্য যে সমস্ত শর্ত আরোপ করেছে তন্মধ্যে রয়েছে, উভয়ের পক্ষ থেকে সম্মতি, জেনে-বুঝে চুক্তি করা, চুক্তিকৃত বস্তু সম্পর্কে জানা, চুক্তির বিষয়বস্তু এবং তাকে কেন্দ্র করে বিন্যস্ত শর্তাবলী সম্পর্কে জানা।

আর এমন প্রত্যেক প্রকারের চুক্তি থেকে নিষেধ করেছে, যার মধ্যে ক্ষতি ও যুলুমের ব্যাপার রয়েছে; যেমন: সকল প্রকার জুয়া, সুদ ও অস্পষ্টতা।

সুতরাং যে ব্যক্তি শরী'আত ভিত্তিক লেনদেনের চিন্তা-ভাবনা করবে, সে ব্যক্তি দেখতে পাবে যে, এটি দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির জন্য

উপযোগী হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর সে সাক্ষ্য দেবে যে, এটি আল্লাহ্‌র ব্যাপক রহমত ও পরিপূর্ণ বিচক্ষণতার উপর প্রমাণবহ; কেননা তিনিই তো তাঁর বান্দাদের জন্য সব ধরনের পবিত্র উপার্জন, খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও স্পষ্ট বিধিবদ্ধ মুনাফা লাভের পদ্ধতিসমূহকে বৈধ করেছেন।

অষ্টম দৃষ্টান্ত

যাবতীয় পবিত্র খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, বিয়ে-সাদী ইত্যাদির বৈধতা সম্পর্কে শরী'আত যা নিয়ে এসেছে, সেই প্রসঙ্গে।

o প্রত্যেক পবিত্র উপকারী বস্তুকেই শরী'আত প্রবর্তক বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন; যেমন: বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যশস্য, ফলমূল, সাধারণভাবে সামুদ্রিক প্রাণী এবং বিশেষ বিশেষ স্থলজ প্রাণীর মাংস; আর প্রত্যেক অপবিত্র বস্তু, যা দ্বীনের জন্য, অথবা বিবেকের জন্য, অথবা শরীরের জন্য অথবা ধন-সম্পদের জন্য ক্ষতিকারক সেগুলো থেকে নিষেধ করেছেন ।

সুতরাং তিনি যা বৈধ করেছেন, তা তাঁর অনুগ্রহ ও তাঁর দ্বীনের সৌন্দর্যের কারণেই করেছেন এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন, তাও তাঁর অনুগ্রহের কারণেই করেছেন; কেননা তিনি তাদেরকে এমন বস্তু থেকে বারণ করেছেন, আর এ নিষেধাজ্ঞা তার দ্বীনের সৌন্দর্যের কারণেই। কারণ সৌন্দর্যের বিষয়টি প্রজ্ঞা, উপযোগিতা ও ক্ষতিকারক বস্তু থেকে রক্ষা করার সাথে সংশ্লিষ্ট।

o অনুরূপভাবে বিয়ের ব্যাপারে যা বৈধ করেছেন তা হল: একজন বান্দা তার পছন্দ অনুযায়ী নারীদের মধ্য থেকে দুই দুই জন, তিন তিন জন এবং চার চার জন করে নারীকে বিয়ে করতে পারবে; কারণ, তাতে উভয় পক্ষের জন্য কল্যাণ রয়েছে, আরও রয়েছে উভয়জনের পক্ষ থেকে ক্ষতি দূরিকরণের ব্যবস্থা।

আর তিনি একজন ব্যক্তির জন্য চারজন স্বাধীন নারীর বেশি একত্রিত করাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ, তাতে যুলুম-নির্যাতন ও বে-ইনছাফির আশঙ্কা থাকে।

এতদসত্ত্বেও তিনি যুলুম-নির্যাতনের আশঙ্কার ক্ষেত্রে এবং দাম্পত্য জীবনে আল্লাহর বিধান কায়েমে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে একজন স্ত্রীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতে উৎসাহিত করেছেন; যাতে করে (যুলুম বন্ধ করার) উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

০ আর যেভাবে বিয়ে-সাদী সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত ও অতি জরুরি বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম বিবেচিত, তেমনিভাবে মানুষের দাম্পত্য জীবনে বনিবনা না হলে, কষ্টসাধ্য অবস্থায় পতিত হলে, এবং সুস্থভাবে জীবনযাপন করা সমস্যাসঙ্কুল হলে তালাকের বৈধতা দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনের ভাষায়:

﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ﴾ [سورة النساء: 130]

“যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাঁর প্রচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩০]

নবম দৃষ্টান্ত

আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল মানবজাতির জন্য পরস্পরের মধ্যে সততা, কল্যাণ, অনুগ্রহ, ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বিচার এবং যুলুম বর্জিত যেসব অধিকারকে বিধিবদ্ধ করেছেন, সেই প্রসঙ্গে।

যেমন ঐ অধিকারসমূহ, যা তিনি বাধ্যতামূলক ও বিধিবদ্ধ করেছেন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, লেনদেনকারীগণ ও প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর জন্য।

আর তার প্রত্যেকটিই অত্যাবশ্যকীয় ও পূর্ণতাদানকারী অধিকার, যেগুলোকে স্বভাব-প্রকৃতি ও সুস্থ বিবেক উত্তম বলে বিবেচনা করে; আর এর মাধ্যমেই পরস্পরের মেলামেশা পূর্ণতা লাভ করে। আর হকদারের অবস্থা ও মর্যাদার আলোকে সকল প্রকার কল্যাণ ও উপকার পরস্পর আদান-প্রদান করা হয়।

আর যখনই আপনি তার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবেন, তখন তাতে দেখতে পাবেন কল্যাণের উপস্থিতি এবং মন্দ বা অকল্যাণের অনুপস্থিতি; আর তাতে পাবেন সাধারণ ও বিশেষ উপকারিতা, বন্ধুত্ব ও পরিপূর্ণ ঘনিষ্ঠতা; যা আপনাকে সাক্ষী করে যে, এই শরী‘আত উভয় জগতের সৌভাগ্যের জিম্মাদার।

আপনি তাতে আরও লক্ষ্য করবেন যে, এই অধিকারসমূহ স্থান, কাল, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সামাজিক প্রথার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে এবং তাকে দেখতে পাবেন সকল প্রকার কল্যাণের নিয়ামক শক্তি হিসেবে,

তাতে অর্জিত হবে ধর্মীয় ও পার্থিব কার্যক্রমের ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা, নিয়ে আসবে মান-মর্যাদা এবং দূর করবে সকল প্রকার শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ।

আর এসব বিষয় কেবল শরী'আতের মৌলিক উৎস ও মূলে সার্বিক পর্যালোচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করার মাধ্যমেই বুঝা যাবে।

দশম দৃষ্টান্ত

মৃত্যুর পর ধন-সম্পদ ও উত্তরাধিকারসত্ব স্থানান্তর এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ধন-সম্পদ বণ্টনের পদ্ধতি নিয়ে শরী'আত যা কিছু নিয়ে এসেছে, সেই প্রসঙ্গে।

আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর মাধ্যমে এর তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন; তিনি বলেছেন:

﴿لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ﴾ [سورة النساء: ١١]

"উপকারে কে তোমাদের নিকটতর, তা তোমরা অবগত নও।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১] সুতরাং আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেই সম্পদের বণ্টন-পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন, কার উপকার বান্দার অধিক নিকটতর, বান্দা স্বভাবত: তার সম্পদ কার কাছে পৌঁছাতে পছন্দ করে, আর কে তার সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহ পাওয়ার বেশি উপযুক্ত, সেটার উপর ভিত্তি করেই তিনি তার বিন্যাস করেছেন। আর এই ধারাবাহিক বিন্যাসকে সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ বলে প্রতিটি সুস্থ বিবেকই সাক্ষ্য প্রদান করে। আর তিনি যদি এই কাজের দায়িত্ব জনগণের মতামত, তাদের খেয়াল-খুশি ও ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করতেন, তবে এর কারণে অর্জিত হত ত্রুটি-বিচ্যুতি, বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থাপনা এবং এমন অপছন্দনীয় মনোনয়ন, যা বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের নামান্তর।

০ আর শরী'আত প্রবর্তক বান্দার জন্য নিয়ম করে দিয়েছেন যে, সে চাইলে সৎকর্ম ও তাকওয়ার (আল্লাহ ভীতির) দৃষ্টিকোণ থেকে তার

সম্পদ থেকে কিছু অংশ এমন খাতে অসীয়ত করবে, যা তার আখেরাতের জীবনে তার উপকার করেবে। আর তিনি এই ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছেন যে, ওসিয়তকারী সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অথবা তার চেয়ে কম অংশ, উত্তরাধিকারী নয় এমন ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত করবে; যাতে করে সম্পদ, যা আল্লাহ মানুষের জন্য জীবন-যাপনের মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন, তা একটা খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত না হয়, স্বল্প বুদ্ধি ও অল্প ধর্মীয় চেতনাবোধসম্পন্ন লোকজন দুনিয়া থেকে তাদের প্রস্থানের সময় যে ধরনের ছিনিমিনি খেলে থাকে। তবে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ অবস্থায় তারা যেহেতু অভাব-অনটনের আশঙ্কা করে থাকে, এমতাবস্থায় তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর কোন খাতে সম্পদ ব্যয় করে না।

একাদশ দৃষ্টান্ত

অপরাধ বিবেচনায় নির্ধারিত দণ্ডবিধি ও বিভিন্ন প্রকার প্রকার শাস্তির ব্যাপারে ইসলামী শরী'আত যা কিছু নিয়ে এসেছে, সেই প্রসঙ্গে।

০ আর এটা এই জন্য যে, সকল প্রকার অপরাধ এবং আল্লাহর হক ও তাঁর বান্দাদের অধিকারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা বড় ধরনের যুলুম-নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত, যা শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে এবং যার দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ হয়। তাই তো শরী'আত প্রবর্তক বিভিন্ন প্রকারের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড, হাত কর্তন, কষাঘাত ও বিভন্ন প্রকার সতর্কতামূলক শাস্তির বিধান করেছেন, যা অপরাধ সংঘটিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে এবং অপরাধ প্রবণতাকে হ্রাস করবে।

আর এই শাস্তির বিধানের মধ্যে সামগ্রিকভাবে অনেক উপকারিতা এবং সাধারণ ও বিশেষ কল্যাণ নিহিত আছে, যার মাধ্যমে বুদ্ধিমান ব্যক্তি শরীয়তের সৌন্দর্য জানতে পারবে। আরও জানতে পারবে যে, শরীয়তের দণ্ডবিধান ছাড়া অন্যায়-অপরাধ নির্মূল করা এবং পরিপূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়; যে দণ্ডবিধানকে শরী'আত প্রবর্তক অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী কম, বেশি, কঠোর ও হালকা করে বিন্যাস করেছেন।

দ্বাদশ দৃষ্টান্ত

মানুষের সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে তার কর্মকাণ্ড যখন তার নিজের জন্য ক্ষতিকারক অথবা অন্যের জন্য ক্ষতিকারক হবে, তখন তার সম্পদে তার হস্তক্ষেপ তথা লেনদেনের অধিকার রহিতকরণের নির্দেশ প্রদানের ব্যাপারে শরী'আত যা কিছু নিয়ে এসেছে, সেই প্রসঙ্গে।

আর তা হল যেমন, পাগল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, নির্বোধ ও তাদের অনুরূপ ব্যক্তিদের ধন-সম্পদ লেনদেনের অধিকার রহিতকরণ, অনুরূপভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিপক্ষ ঋণদাতাদের স্বার্থ রক্ষার্থে ঋণী ব্যক্তির ধন-সম্পদ লেনদেনের অধিকার রহিতকরণ।

o আর এই সব কিছুই ইসলামী শরীয়তের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত; কারণ, শরী'আত মানুষকে তার এমন সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করেছে, যাতে মৌলিকভাবে তার হস্তক্ষেপ করার অবারিত সুযোগ ছিল; কিন্তু যখন তার সম্পদে তার হস্তক্ষেপ করাতে তার উপকারের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয় এবং তার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের দিকটি বড় হয়, তখন শরী'আত প্রবর্তক তার জন্য যাবতীয় কল্যাণকর খাতেও তার সকল প্রকার ব্যয়ের অধিকারকে নিষিদ্ধ করে; এই কথা বুঝানোর জন্য যে, যাতে জনগণ ক্ষতিকারক খাতকে বাদ দিয়ে প্রত্যেক উপকারী খাতে তাদের সম্পদ ব্যয়ের অধিকার প্রয়োগে সচেষ্ট হয়।

ত্রয়োদশ দৃষ্টান্ত

অধিকার প্রাপ্য ব্যক্তিদের অধিকারকে সুদৃঢ় করার জন্য শরী‘আত সম্মত চুক্তি বা চুক্তিপত্র গ্রহণের ব্যাপারে শরী‘আত যা কিছু নিয়ে এসেছে, সেই প্রসঙ্গে।

o আর এগুলো হল যেমন, সাক্ষ্য-সনদ, যার দ্বারা অধিকার আদায় করা যাবে, অস্বীকার করা থেকে বিরত রাখবে এবং তার কারণে সন্দেহ দূর হবে।

আর এগুলোর আরও কিছু উদাহরণ হল: বন্ধক, জামানত বা গ্যারান্টি ও জিম্মাদারি; এগুলো তখন কাজে আসবে, যখন কোন ব্যক্তি কারও নিকট থেকে তার অধিকার বা পাওনা আদায়ে অপারগ হবে, তখন পাওনাদার ব্যক্তি ঐ চুক্তিপত্রের দারস্থ হবে, যার বলে তার অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে।

এই ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই যে, এই পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপকারিতা রয়েছে; আরও রয়েছে অধিকার সংরক্ষণ, লেনদেন সম্প্রসারণ, তাকে ন্যায় ও ইনসাফের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো, পরিবেশ-পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং লেনদেনকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা।

সুতরাং যদি চুক্তি বা চুক্তিপত্রের ব্যবস্থা না থাকত, তবে লেনদেনের একটা বড় অংশ বন্ধ হয়ে যেত। অতএব, এই চুক্তিপত্র পাওনাদার ও দেনাদার উভয়ের জন্যই বিভিন্ন কারণে উপকারী।

চতুর্দশ দৃষ্টান্ত

শরী‘আত প্রণেতা কর্তৃক ইহসান তথা অনুগ্রহ করার প্রতি উৎসাহ দান; যা ইহসানকারীকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রতিদানের ব্যবস্থা করে দেবে এবং জনগণের নিকট তার জন্য এনে দেবে সুখ্যাতি। তারপর তার কাছে তার সম্পদ হুবহু অথবা অনুরূপ ফেরত আসবে। সুতরাং কোন প্রকার ক্ষতির স্পর্শ ছাড়াই এই প্রকারের গুণের অধিকারী ব্যক্তির অর্জনই সবচেয়ে সম্মানিত অর্জন বলে বিবেচিত হবে।

আর এই ইহসানের উদাহরণ হল: ঋণ প্রদান, ধার দেয়া ইত্যাদি।

সুতরাং এর মধ্যে রয়েছে এত বিপুল পরিমাণ জনকল্যাণ, প্রয়োজন পূরণ, দুঃখ-কষ্ট লাঘব এবং কল্যাণ ও পুণ্য লাভের ব্যবস্থা, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না।

আর অনুগ্রহকারী ব্যক্তির নিকট তার সম্পদ ফিরে আসবে এবং তার প্রতিপালকের নিকট থেকেও প্রচুর পরিমাণে সাওয়াব পাবে; আর তিনি কল্যাণ, বরকত, উদারতা এবং ভালবাসা ও আন্তরিকতার পাশাপাশি তার ভাইয়ের নিকট ইহসান ও সুন্দরের নমূনা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আর নির্ভেজাল ইহসান তথা অনুগ্রহ হল এমন, যা ইহসানকারী ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে দান করেন এবং যা আর দাতার নিকট ফিরে আসে না; ইতঃপূর্বে যাকাত ও সাদকার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তার তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পঞ্চদশ দৃষ্টান্ত

ঐ সব মূলনীতি ও বিধিবিধান প্রসঙ্গে, যা শরী'আত প্রবর্তক বিবাদ মীমাংসার জন্য, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে এবং বাদী ও বিবাদীর একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য প্রণয়ন করেছেন।

তা হচ্ছে এমন কতগুলো মূলনীতি, যা ন্যায়, দলিল-প্রমাণ, সামাজিক প্রথার ধারাবাহিকতা ও স্বভাব-প্রকৃতির সামঞ্জস্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত; কেননা শরী'আত প্রবর্তক, এমন প্রত্যেক দাবীদারের জন্য যে কোন কিছুর অথবা কোন হকের (অধিকারের) দাবি করে, তার সপক্ষে দলিল পেশ করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। সুতরাং সে যখন এমন দলিল নিয়ে আসবে, যা তার দাবির পক্ষে জোরালো ভুমিকা রাখবে এবং তাকে শক্তিশালী করবে, তখন তার জন্য তার দাবিকৃত হক বা অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যখন সে তার দাবির পক্ষে দলিল-প্রমাণ নিয়ে আসতে ব্যর্থ হবে, তখন বিবাদী বাদীর দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে শপথ করবে এবং তার উপর বাদির জন্য কোন অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

০ আর শরী'আত প্রবর্তক বস্তুর মান অনুযায়ী দলিল-প্রমাণের বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন; আর তিনি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও মানুষের মাঝে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা সামাজিক প্রথাকেও দলিল-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সুতরাং দলিল-প্রমাণ হল এমন প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়ের নাম, যা সত্যকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে এবং তাকে প্রমাণিত করে।

আর তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বের সময় এবং বাদী ও বিবাদীর সমান অবস্থানের ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ আপোস-মীমাংসার পদ্ধতির কথা বলেছেন, যা হবে বিভিন্ন সমস্যা ও বিরোধ মীমাংসার প্রত্যেকটি সমাধান-পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সুতরাং এমন প্রতিটি পদ্ধতি যাতে কোন যুলুম নেই, আর তা তাদের জন্য উপকারী হওয়ার পরও তাদেরকে কোন গোনাহের কাজে প্রবৃত্ত করে না, শরী'আত সেটাকেই ঝগড়ার মূলোৎপাটন ও বিবাদ-বিসম্বাদ নিরসনের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আর তিনি এই নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও দুর্বল এবং রাজা ও প্রজার মধ্যে সার্বিক অধিকার প্রশ্নে সমতা বিধান করেছেন।

আর তিনি ন্যায়বিচার করা এবং যুলুম বা অবিচার না করার পদ্ধতি প্রচলন করার মাধ্যমে বাদী-বিবাদীদেরকে সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা করেছেন।

ষোড়শ দৃষ্টান্ত

পরামর্শ ভিত্তিক কাজের ব্যাপারে শরী‘আত যা কিছু নিয়ে এসেছে, আর মুমিনদের জন্য তাদের ধর্মীয়, পার্থিব, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল কর্মকাণ্ড পরামর্শ ভিত্তিক পরিচালিত হওয়ার বিষয়টি শরী‘আত কর্তৃক প্রশংসনীয় হওয়া প্রসঙ্গে।

o আর এই বড় মূলনীতিটির যথার্থতার ব্যাপারে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন; তারা আরও একমত পোষণ করেছেন যে, এটা হল উদ্দেশ্যসমূহ হাসিল, সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও ন্যায়নীতি প্রচলনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও উত্তম উপায় অবলম্বনের একমাত্র মাধ্যম।

আর এই মূলনীতি ঐসব জাতিকে উন্নত করে, যারা সকল প্রকার কল্যাণ ও উপকার হাসিলের জন্য তার উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম পরিচালনা করে। আর যখনই মানুষের জানাশুনা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের ধ্যানধারণার ব্যাপ্তি ঘটে, তখন তারা এর প্রচণ্ড প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাপ অনুধাবন করতে পারে।

আর যখন মুসলিমগণ ইসলামের শুরুতে তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব কর্মকাণ্ডসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই মূলনীতির প্রয়োগ করেছিল, তখন তাদের কর্মকাণ্ডসমূহ সঠিক ছিল এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি ছিল উন্নত ও সমৃদ্ধির মধ্যে। অতঃপর তারা যখন এই মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল, তখন তাদের দ্বীন এবং দুনিয়ার অধঃপতন হতে থাকল, এমনকি

শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা আপনি লক্ষ্য করছেন। সুতরাং তারা যদি এখনও আবার তাদের দ্বীন তথা জীবনব্যবস্থাকে এই মূলনীতির উপর ফিরিয়ে আনতে পারে, তবে তারা সফলকাম হবে এবং মুক্তি পাবে।

সপ্তদশ দৃষ্টান্ত

নিশ্চয় এই শরী‘আত দ্বীন এবং দুনিয়ার সংস্কার নিয়ে এসেছে; আরও নিয়ে এসেছে শরীর এবং আত্মার মাঝে সমন্বিত কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা।

আর এই মূলনীতির ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে; আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল এই দু’টি জিনিসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন; আর এই দু’টির প্রত্যেকটি পরস্পরের সহায়ক এবং এই মূলনীতির পৃষ্ঠপোষক।

আর আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব করার জন্য এবং তাঁর অধিকার তথা হকসমূহ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য; আর তিনি তাদেরকে প্রচুর রিযিক (জীবিকা) দান করেছেন এবং তাদের জন্য রিযিক লাভের উপায়-উপকরণ ও জীবনযাপনের পদ্ধতিসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; যাতে তারা তাঁর ইবাদত করার জন্য এসব উপায়-উপকরণের সহযোগিতা নিতে পারে এবং এগুলো যাতে তাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আর তিনি এককভাবে আত্মার খাদ্যের যোগান দিতে এবং শরীরকে অযত্ন ও অবহেলা করতে নির্দেশ দেন নি।

যেমনিভাবে তিনি নিষেধ করেছেন ভোগ-বিলাস আর লোভ-লালসায় মত্ত থাকতে; আর নির্দেশ দিয়েছেন হৃদয় ও আত্মার উপকারী বস্তুসমূহকে

শক্তিশালী করতে। আর এই বক্তব্যটি অপর এক মূলনীতিতে (দৃষ্টান্তে) আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে; তা হচ্ছে:

অষ্টাদশ দৃষ্টান্ত

নিশ্চয় শরী‘আত, ইলম (জ্ঞান), দ্বীন, প্রশাসন ও বিধিবিধানকে একটি অপরটির শক্তিবর্ধক ও সাহায্য সহযোগিতাকারীরূপে নির্ধারণ করেছে।

০ সুতরাং ইলম (জ্ঞান) ও দ্বীন প্রশাসনকে শক্তিশালী করে; আর তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে ক্ষমতা ও বিধিবিধান।

আর প্রশাসন সামগ্রিকভাবে জ্ঞান ও দ্বীনের সাথে শর্তযুক্ত, যা হল হিকমত বা কলাকৌশল তথা প্রজ্ঞা। আর তা-ই হচ্ছে, সঠিক পথ এবং কল্যাণ, সফলতা ও মুক্তি।

সুতরাং দ্বীন ও ক্ষমতা বা রাজত্ব যখন একটি অপরটির পরিপূরক ও সহায়ক শক্তি হয়, তখন কর্মকাণ্ডসমূহ পরিশুদ্ধ হয়, যেমনিভাবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি হয় সুসংহত।

আর যখনই একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করা হয়, তখন শাসনব্যবস্থা দুর্বল ও অকেজো হয়ে যায়, তার যথার্থতা ও সংস্কারমূলক মানসিকতার বিলুপ্তি ঘটে, পার্থক্য ও দলাদলি সৃষ্টি হয়, আন্তরিক দূরত্ব বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের কর্মকাণ্ড অবক্ষয় ও অবনতির দিকে ধাবিত হয়।

এর সমর্থনপুষ্ট কথা হল: জ্ঞান বিজ্ঞান যতই সম্প্রসারিত হউক, জানাশুনা যতই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হউক এবং আবিষ্কারসমূহ যতই বড় ও সংখ্যায় অধিক হউক, তা থেকে এমন কিছুর আগমন হয় না, যা

আল-কুরআনের নির্দেশনার বিপরীত এবং শরী‘আত যা নিয়ে এসেছে, তার বিরোধী।

শরী‘আত এমন কিছু নিয়ে আসে না, যাকে বিবেক-বুদ্ধি অসম্ভব মনে করে; বরং শরী‘আত যা নিয়ে আসে, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি তার সৌন্দর্যকে যথাযথ সমর্থন করে; অথবা শরী‘আত এমন কিছু নিয়ে আসে, যা মৌলিক বা বিস্তারিতভাবে জানার ব্যাপারে বিবেক সঠিক পথ পায় না। আর এর জন্য আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা প্রয়োজন; আর তা হল:

ঊনবিংশ দৃষ্টান্ত

শরী'আত এমন কিছু নিয়ে আসে না, যাকে বিবেক-বুদ্ধি অসম্ভব মনে করে, আর এমন কিছুও নিয়ে আসে না বিশুদ্ধ বিদ্যা তার বিরোধিতা করে।

আর এটা এই কথার উপর সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে যা এসেছে, তা মজবুত ও স্থায়ী, আর তা সকল কালের ও স্থানের উপযোগী।

o আর এই নিখিল বিশ্বে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা দুর্ঘটনা ও সমাজ বিজ্ঞানের ঘটনাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করার মাধ্যমে এই সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলো বিস্তারিতভাবে বুঝা যায়। আর এইগুলোর ব্যবহার ও প্রয়োগ তখন হবে, যখন তা হবে শরী'আত যা নিয়ে এসেছে সে অনুযায়ী যথাযথ বাস্তবতার অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নিশ্চয়ই তা (কুরআন) প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং তা ছোট ও বড় সকল কিছুকেই শামিল করেছে।

বিংশ দৃষ্টান্ত

ইসলামের অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ব্যাপক ও দিগন্ত জোড়া বিজয়সমূহে সামগ্রিক দৃষ্টিপাত; অতঃপর শত্রুদের প্রকাশ্য শত্রুতা, প্রচণ্ড বিরোধিতা ও তার সাথে তাদের চিরাচরিত সংঘাতমুখর অবস্থান সত্ত্বেও সম্মানের সাথে তা বিদ্যমান থাকার ব্যাপারটি সম্পর্কে।

o আর এটা বুঝা যায়, এই দ্বীন তথা জীবনব্যবস্থার উৎসের দিকে নজর দিলেই; কিভাবে তা আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের অন্তরের মধ্যে বিভেদ এবং প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিদ্যমান থাকার পরেও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে; আর কিভাবে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করেছে, তাদের দূরবর্তীদেরকে নিকটবর্তীদের সঙ্গে একত্রিত করেছে এবং তাদের মধ্যকার ঐ শত্রুতাকে দূর করে দিয়েছে; আর ঈমানী ভ্রাতৃত্ববোধকে তার যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করেছে।

অতঃপর তারা পৃথিবীর দিক দিগন্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার বিভিন্ন ভূখণ্ডকে জয় করার জন্য; আর এই ভূখণ্ডসমূহের শীর্ষে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী পারস্য ও রোম জাতি; যাদের রাজত্ব ছিল বিরাট, শক্তি ছিল প্রচণ্ড আকারের এবং সংখ্যা ও স্থায়িত্বের দিক থেকে ছিল অনেক বেশি পরিমাণে; অতঃপর তারা এই উভয় সাম্রাজ্যকে জয় করেছে এবং এই জয় সম্ভব হয়েছিল তাদের দ্বীন, ঈমানী শক্তি এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহযোগিতার বদৌলতে; এমনকি শেষ পর্যন্ত ইসলাম পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

অতঃপর এটাকে আল্লাহ তা‘আলার অন্যতম নিদর্শন, তাঁর দ্বীনের সত্যতার দলিল এবং তাঁর নবীর মু‘জিযা হিসেবে গণনা করা হয়; আর এই জন্যই মানবজাতি কোন প্রকার জোরজবরদস্তি ও অস্থিরতা ছাড়াই স্বজ্ঞানে দৃঢ় আস্থার সাথে দলে দলে এই দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করেছে ও করছে।

o অতএব যে ব্যক্তি এই বিষয়টির প্রতি সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি দেবে, সে বুঝতে পারবে যে, এটা হল সত্য দ্বীন, যার মোকাবিলায় বাতিল কিছুতেই সফল হবে না, যতই সে শক্তিশালী হোক এবং তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি যতই প্রবল হোক না কেন।

এটা বুঝা যাবে স্বয়ংক্রিয় জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে এবং তাতে কোন ন্যায়পরায়ণ লোক সন্দেহ পোষণ করবে না; আর তা অত্যাবশ্যক বা জরুরি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এই যুগের লেখকদের একটি দল তার বিপরীত কথা বলেন, যাদেরকে অসমর্থিত চিন্তাধারা ইসলামের শত্রুদের সমর্থন করার দিকে ঠেলে দিয়েছে; সুতরাং তারা ধারণা করে যে, ইসলামের সম্প্রসারণ ও তার বিস্ময়কর বিজয়সমূহ নির্ভেজাল বস্তুগত বিষয় ও কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত; আর তারা এই বিজয়সমূহকে তাদের ভুল ধারণার ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করেছে।

আর তাদের এই বিশ্লেষণটির মাধ্যমে যে কথাটি তারা বলতে চাচ্ছে তা হচ্ছে, ইসলামের বিজয় মূলত: পারস্য ও রোম সম্রাটদের রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার কারণে, আর আরবের বস্তুগত শক্তির আধিক্যতার কারণে।

নিঃসন্দেহে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাই তাদের উপরোক্ত কল্পনাপ্রসূত বিশ্লেষণ বাতিল করার জন্য যথেষ্ট।

কারণ, আরবের মধ্যে ঐ সময়ে এমন কোন শক্তি ছিল, যার দ্বারা তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা সরকারসমূহের মধ্য থেকে একটি ক্ষুদ্রতম সরকারকে প্রতিরোধ করা বা উৎখাত করার মত উপযুক্ত ছিল? সে সময়ের মধ্যে সাধারণভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং একই সময়ে জনসংখ্যা ও প্রস্তুতির দিক থেকে বিশাল বড় রাষ্ট্র ও জাতিকে প্রতিরোধ করা তো দূরে থাক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা (মুসলিমগণ) সামগ্রিকভাবে ঐসব সাম্রাজ্যকে টুকরা টুকরা করে দিয়েছিল এবং ঐসব শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো আল-কুরআন ও ইনসাফপূর্ণ দ্বীনের বিধানসমূহ দখল করে নিয়েছিল, যা প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ও হকপন্থী লোক তার যথার্থতা উপলব্ধি করে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

সুতরাং শুধুমাত্র বস্তুগত বিষয়ে আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এই সম্প্রসারিত ব্যাপক বিজয় অর্জিত হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা সম্ভব কি?

এই ধারায় শুধু তারাই কথা বলে, যারা ইসলামী জীবনব্যবস্থার মধ্যে দুর্নাম ছড়িয়ে দিতে চায়, অথবা তারাই এই ধরনের কথা বলে, যাদের মধ্যে শত্রুদের কথা বাস্তবতা বিবর্জিত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে।

o অতঃপর ধারাবাহিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা এবং শত্রুদের প্রকাশ্য শত্রুতার পরেও এই দ্বীন তার যথাযথ স্বকীয়তা নিয়ে অবশিষ্ট থাকাটা এই দ্বীনের নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম; আর এটাই সত্যিকার অর্থে

আল্লাহর দ্বীন। সুতরাং যদি এমন পর্যাপ্ত শক্তি এই দ্বীনকে সহযোগিতা করে, যা তার ব্যাপারে সীমলংঘনকারীদের বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহীদের বিদ্রোহকে প্রতিরোধ করে, তবে পৃথিবীতে এই দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অবশিষ্ট থাকত না এবং কোন প্রকার জোর জবরদস্তি ও বাধ্যবাধকতা ছাড়াই মানবজাতি তাকে গ্রহণ করত। কারণ, তা হল সত্যের ধর্ম, স্বভাবধর্ম এবং সততা ও সংস্কারের ধর্ম; কিন্তু তার অনুসারীদের সংকীর্ণতা, দুর্বলতা, অনৈক্য ও তাদের উপর তাদের শত্রুদের নির্যাতন-নিষ্পেষণই তার অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিয়েছে; সুতরাং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এই অবস্থা থেকে উত্তরণের কোন শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের নেই।

একবিংশ দৃষ্টান্ত

পূর্বে আলোচিত প্রত্যেক বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বিশুদ্ধ ও কল্যাণকর আকিদা-বিশ্বাস; আত্মা ও বিবেক-বুদ্ধিকে মার্জিত রূপদানকারী উত্তম চরিত্র; পরিস্থিতি-পরিবেশ সংস্কারকারী ও সমুন্নতকারী কর্মকাণ্ড; মূল ও শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ; প্রতিমাপূজা ও সৃষ্টিপূজা প্রত্যাখ্যান; দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠতা ও ইখলাস সৃষ্টিজগতের রব আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদন করা; চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা বিরুদ্ধ সকল প্রকার কুসংস্কার পরিহার করা; সাধারণ কল্যাণ; সকল প্রকার অন্যায়-অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করা; ন্যায়বিচার করা ও সকল ধরনের যুলুম-নির্যাতন মূলোৎপাটন করা এবং সকল প্রকার উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধানে উৎসাহিত করা ইত্যাদি মূলনীতিমালার উপর দ্বীনে-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত।

o আর এই বাক্যগুলোর বিস্তারিত বিবরণ অনেক দীর্ঘ হবে; ন্যূনতম বুঝ বা জানাশুনা আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই সন্দেহমুক্ত ও সুস্পষ্টভাবে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও বিবরণের পথ পাবে, যাতে কোন প্রকার সমস্যা বা জটিলতা থাকবে না।

আর আমরাও এই আলোচনাটিকে তার সংক্ষিপ্ততার উপর সীমাবদ্ধ রাখা উচিত মনে করি; কেননা তা এমন কতগুলো মূলনীতি ও নিয়ম-কানুনকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার মাধ্যমে ইসলামের পরিপূর্ণতা, মহত্ব ও সকল কিছুর প্রকৃত সংস্কারকারী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টরূপে জানা যায়।

আর আল্লাহর নিকট তাওফীক কামনা করি।

১৩৬৪ সালের জমাদিউল উলা মাসের প্রথম দিন
লেখাটি সম্পন্ন হলো।

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه و سلم.

যার কলম থেকে:
আবদুর রহমান ইবন নাসের ইবন সা‘দী

সূচিপত্র

* **ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত:** এই দ্বীন জিহাদ, সকল প্রকার সৎকর্মের নির্দেশ এবং সকল ধরনের অসৎকর্ম থেকে নিষেধের বিধান নিয়ে এসেছে	
* **সপ্তম দৃষ্টান্ত:** ক্রয়-বিক্রয় ও বিভিন্ন প্রকার লেনদেনের বৈধতা সম্পর্কে শরী'আত যা নিয়ে এসেছে, সেই প্রসঙ্গে	
- লেনদেন বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ	
* **অষ্টম দৃষ্টান্ত:** যাবতীয় পবিত্র বস্তুর বৈধতা সম্পর্কে শরী'আত যা নিয়ে এসেছে, সেই প্রসঙ্গে	
- বৈধ ও অবৈধ খাদ্যদ্রব্যসমূহ	
- বিয়ে-সাদীর বৈধতা ও তার প্রভাব	
- তালাক	
* **নবম দৃষ্টান্ত:** আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল মানবজাতির মধ্যে যেসব অধিকারকে বিধিবদ্ধ করেছেন, সেই প্রসঙ্গে	
* **দশম দৃষ্টান্ত:** মৃত্যুর পর ধন-সম্পদ ও উত্তরাধিকার সত্ব স্থানান্তর পদ্ধতি নিয়ে শরী'আত যা কিছু নিয়ে এসেছে, সেই প্রসঙ্গে	
- আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক উত্তরাধিকার সত্ত্ব বণ্টনের তাৎপর্য	
- অসীয়ত	
* **একাদশ দৃষ্টান্ত:** দণ্ডবিধির ব্যাপারে ইসলামী শরী'আত যা কিছু নিয়ে এসেছে, সেই প্রসঙ্গে	
* **দ্বাদশ দৃষ্টান্ত:** মানুষের সম্পদে তার ক্ষতিকারক হস্তক্ষেপের অধিকার রহিতকরণের ব্যাপারে শরী'আত যা কিছু নিয়ে এসেছে, সেই প্রসঙ্গে	

* **ত্রয়োদশ দৃষ্টান্ত:** অধিকারের অধিকারী ব্যক্তিদের অধিকারকে সুদৃঢ় করার জন্য শরী'আত সম্মত চুক্তি বা চুক্তিপত্র গ্রহণের ব্যাপারে শরী'আত যা কিছু নিয়ে এসেছে, সেই প্রসঙ্গে	
* **চতুর্দশ দৃষ্টান্ত:** শরী'আত কর্তৃক উত্তম ঋণ, ধার প্রদান ও অনুরূপ সহযোগিতার মাধ্যমে ইহসান বা অনুগ্রহ করার প্রতি উৎসাহ দান প্রসঙ্গ	
* **পঞ্চদশ দৃষ্টান্ত:** ঐ সব মূলনীতি, যা শরী'আত প্রবর্তক বিবাদ মীমাংসার ভিত্তি হিসেবে প্রণয়ন করেছেন	
- দলিল-প্রমাণের পরিচয়	
* **ষোড়শ দৃষ্টান্ত:** পরামর্শ ভিত্তিক কাজ পরিচালনার ব্যাপারে শরী'আত যা কিছু নিয়ে এসেছে, সে প্রসঙ্গে	
* **সপ্তদশ দৃষ্টান্ত:** শরী'আত দ্বীন এবং দুনিয়ার সংস্কার নিয়ে এসেছে	
* **অষ্টাদশ দৃষ্টান্ত:** শরী'আত ইলম (জ্ঞান), দ্বীন, প্রশাসন ও বিধিবিধানকে একটি অপরটির শক্তিবর্ধক ও সহযোগিতাকারীরূপে নির্ধারণ করেছে	
* **ঊনবিংশ দৃষ্টান্ত:** নিশ্চয়ই শরী'আত এমন কিছু নিয়ে আসে না, যাকে বিবেক-বুদ্ধি অসম্ভব মনে করে	
* **বিংশ দৃষ্টান্ত:** ইসলামের ব্যাপক বিজয়সমূহের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত	
- যে ব্যক্তির ধারণা 'ইসলামের বিজয় ছিল শুধুমাত্র বস্তুগত শক্তির মাধ্যমে', তার জবাব	
- ধারাবাহিক বিপর্যয় এবং শত্রুদের প্রকাশ্য শত্রুতার	